ইউনিট
২২

দারিদ্র্য ও কৃষি সমস্যা

ভূমিকা

দারিদ্র্য সমগ্র মানবজাতির জন্যই একটি ভয়াবহ অভিশাপ। বাংলাদেশের অসংখ্য অর্থ-সামাজিক সমস্যার মূলে রয়েছে দারিদ্র্য। দেশের সার্বিক উন্নয়নে দারিদ্র্য বিমোচনের কোন বিকল্প নেই। তবে দারিদ্র্য দূর করা সহজ নয়। কেননা একটি দুষ্টচক্রের মতো দারিদ্র্য গণ-সমাজে ঘুরপাক খায়। বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচন সন্তোষজনক নয়। এ ইউনিটে নিম্নোক্ত পাঠগুলো আলোচনা করা হলো:

পাঠ-১ : বাংলাদেশে দারিদ্র্যের কারণ।
পাঠ-২ : দারিদ্র্য নিরসনের উপায়ে।
পাঠ-৩ : বাংলাদেশের কৃষি সমস্যা।
পাঠ-৪ : কৃষির বহুমুখীকরণ ও সরকারি নীতি।
পাঠ-৫ : খাদ্যাভাব ও পুষ্টিহীনতা।
পাঠ-৬ : খাদ্যাভাব ও পুষ্টিহীনতা দূর করার উপায়।

পাঠ-১ : বাংলাদেশে দারিদ্র্যের কারণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- বাংলাদেশের দারিদ্র্যের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।
- বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।

বাংলাদেশ দারিদ্র্যের কারণ

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র দেশ । এখানে সম্পদের স্বল্পতা রয়েছে আর এটিই দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ । দারিদ্র্যের কারণ নিয়ে অর্থনীতিবিদ, গবেষক পরিকল্পনাবিদদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে । নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. অমর্ত্য সেনের মতে, মানবসমাজে দারিদ্র্য ও অনুন্নয়নের মূল কারণ সামাজিক বৈষম্য । অর্থনীতিবিদ সেলিম জাহানের মতে, আয়ের অসম বণ্টন দারিদ্র্যের কারণ । আবার বাংলাদেশের পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নিম্ন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, আয়ের অসম বণ্টন, উৎপাদনের অসম বণ্টন, বেকারত্ব ও অর্ধ-বেকারত্ব, জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহার, মানবসম্পদ উন্নয়নের নিম্নহার, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদিকে দারিদ্র্যের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে । বাংলাদেশে দারিদ্র্যের প্রধান কারণগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১. ভূমির অপ্রতুলতা

বাংলাদেশে মাত্র ১,৪৭,৫৭০ বর্গ মিলোমিটার ভূখণ্ডে প্রায় ১৬ কোটি লোকের বাস । ফলে স্বাভাবিক কারণেই মাথাপিছু জমির পরিমাণ কম । তদুপরি এ স্বল্প পরিমাণ জমিও সমভাবে বণ্টিত নয় । দেশের অধিকাংশ জমির মালিকানা স্বল্প সংখ্যক জোতদারের হাতে রয়েছে । এতে করে প্রকৃত কৃষকগণ কৃষি জমি থেকে বঞ্চিত হয়ে কর্মহীন ও আয়হীন অবস্থায় দিন দিন দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছে ।

২. দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি

এটিও বাংলাদেশের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ । স্বাধীনতার পর মাত্র ৪০ বছর ব্যবধানে জনসংখ্যা দ্বিগুণের চেয়েও বেশি হয়েছে । কিন্তু কৃষিজমি একটুকুও বাড়েনি, বরং কমেছে । জমি প্রতিবছরই খণ্ড-বিখণ্ড হচ্ছে । মাথাপিছু জমির পরিমাণ কমছে, উৎপাদন কমছে । সৃষ্টি হচ্ছে নতুন নতুন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ।

৩. নিম্ন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নিম্নহার দারিদ্র্যের আর একটি কারণ । নব্বইয়ের দশকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ছিল ৩.৫ শতাংশ । ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার ৬.২১ শতাংশ । জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধির তুলনায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আশানুরূপ হয়নি । এতে দারিদ্র্য বেড়েছে ।

৪. সম্পদের স্বল্পতা

সম্পদের স্বল্পতা বাংলাদেশে দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ । জমি থেকে শুরু করে প্রাকৃতিক সম্পদ কোনোটাই আমাদের অফুরন্ত নয় । রংপুরে সামান্য কিছু কয়লা, সিলেটের শাহজীর বাজারের কিছু চিনামাটি ও কাঁচাবালি, আর অন্যান্য স্থানে রয়েছে কিছু চুনাপাথর । এই হচ্ছে আমাদের প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ । বনজ সম্পদ অত্যন্ত কম । সম্পদের স্বল্পতার কারণ আমাদের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ ।

৫. উৎপাদন উপকরণ ও সম্পদের উপর প্রবেশাধিকার না থাকা

আমাদের দেশের অধিকাংশ জনগণের আর্থিক অবস্থা খারাপ । কারণ দেশের মাথাপিছু বার্ষিক আয় মাত্র ৫৯৯ মার্কিন ডলার । ফলে উৎপাদনের জন্য উপকরণ সংগ্রহ করার সামর্থ্য তাদের নেই । এছাড়া তাদের অনেকের বাড়ি-ঘরসহ তেমন কোনো সম্পদ নেই । ফলে তারা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে না । এতে দরিদ্র ব্যক্তি আরো দরিদ্র হচ্ছে এবং বছর বছর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি হচ্ছে ।

৬. বেকারত্ব

দেশের উৎপাদনক্ষম জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ বেকার। তারা কোনো কাজ পাচ্ছে না। ফলে কর্মহীন অবস্থায় তাদের মূল্যবান সময় নষ্ট হচ্ছে। দেশ বঞ্চিত হচ্ছে তাদের সেবা থেকে। এতে মোট উৎপাদন বাড়ছে না, বরং মাথাপিছু উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। ফলে তারা ধীরে ধীরে দারিদ্র্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

৭. ঔপনিবেশিকতা ও নব্য-ঔপনিবেশিকতা

ব্রিটিশ আমলের দীর্ঘ দু'শ বছরের ঔপনিবেশিক শাসন এবং পাকিস্তান আমলের অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে এ দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী হয়নি। ঔপনিবেশিক শাসকদের উদাসীনতা ও বৈষম্য নীতির কারণে গড়ে ওঠেনি কোনো কল-কারখানা। ফলে দেশের অর্থনীতি সামনের দিকে এগোনোর পরিবর্তে বরং পিছিয়ে পড়েছে। এ প্রেক্ষিতে সৃষ্টি হয়েছে দারিদ্র্য।

৮. সম্পদের অসম বণ্টন

বাংলাদেশে সম্পদের পরিমাণ এমনিতেই কম। তদুপরি এ সম্পদের বিরাট অংশ অল্প কিছু লোকের হাতে আটকা পড়ে আছে। এর ফলে কিছুসংখ্যক লোক যেমন সম্পদের পাহাড় গড়ে ভোগ বিলাসে মত্ত, তেমনি জনগোষ্ঠীর অন্যরা সম্পদের অভাবে মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। বাংলাদেশে বর্তমানে কোটিপতির সংখ্যা বাইশ হাজার। এ থেকেই দেশে সম্পদের অসম বণ্টনের এক ভয়াবহ চিত্র ফুটে ওঠে। আর সম্পদের অসম বণ্টন জন্ম দিচ্ছে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর।

৯. কর্মসংস্থানের অভাব

অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৮ অনুযায়ী ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরে দেশে কর্মক্ষম জনসংখ্যা প্রায় ৪.৯৫ কোটি। এ বিশাল কর্মীবাহিনীর প্রায় ৪০ ভাগ হচ্ছে বেকার। অর্থাৎ এদের জন্য কোন কাজ নেই। অন্য এক হিসাব মতে, দেশে বর্তমানে উচ্চ শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ৮০ লক্ষাধিক। ফলে কর্মসংস্থানের অভাবে তারা তাদের শ্রম সম্পদ হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ছে। যার ফলাফল হচ্ছে নতুন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি।

১০. প্রাকৃতিক দুর্যোগ

প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন নদী ভাঙ্গন, বন্যা, ঝড়, সাইক্লোন, টর্নেডো, খরা ইত্যাদি আমাদের দেশে একটি নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নদী ভাঙ্গনের ফলে বিভিন্ন নদী তীরবর্তী লোকেরা তাদের চাষযোগ্য জমি, বসতবাড়ি ইত্যাদি হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পথে নামতে বাধ্য হচ্ছে। আবার সাইক্লোন, টর্নেডোর মতো দুর্যোগগুলো জনগণের জানমালের অপূরণীয় ক্ষতি করছে। খরার ফলে ফসল হারিয়ে প্রান্তিক কৃষকেরা দিশেহারা হয়ে পড়ছে। আর এসব দুর্যোগের চূড়ান্ত পরিণতিতে সৃষ্টি হচ্ছে দারিদ্র্য।

১১. শিক্ষার অভাব

দেশের অধিকাংশ মানুষ এখনো নিরক্ষর। বর্তমানে শিক্ষার হার প্রায় ৬৫ ভাগ বলা হলেও এদের একটা বড় অংশ কেবল নাম স্বাক্ষর করতে পারে। শিক্ষাজ্ঞান না থাকায় এরা কায়িক শ্রম দেয়া ছাড়া অন্য কোন কাজ পাচ্ছে না। ফলে এরা অধিকাংশই কৃষি শ্রমিক। বাংলাদেশের স্বল্প পরিমাণ কৃষি জমি এত বিরাট জনসংখ্যার কাজের যোগান দিতে অক্ষম। ফলশ্রুতিতে এরা কেউ আংশিক বেকার, কেউবা পুরোপুরি বেকার। কর্মসংস্থান না হওয়ায় দেশের জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যে নিপাতিত হয়।

১২. দক্ষতার অভাব

বর্তমান পৃথিবীতে দক্ষতা ব্যতীত কোনো কাজেই চাহিদা নেই। হোক সেটি কল-কারখানা, অফিস-আদালত বা কৃষি খামার। কর্মদক্ষতার অভাবে অনেক শিক্ষিত যুবকও কাজ পাচ্ছে না। আর যারা কাজ পাচ্ছে তারা উৎপাদন কার্যে আশানুরূপ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছে না। তাছাড়া দক্ষ লোক না থাকায় সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা ও দারিদ্র্য বিমোচনের মতো কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না। ফলে দেখা যাচ্ছে দক্ষতার অভাবও আমাদের দারিদ্র্যের জন্য অনেকখানি দায়ী।

১৩. অপুষ্টি

অপুষ্টি বাংলাদেশের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ। বিশ্বব্যাংকের এক তথ্যানুযায়ী বর্তমানে দেশের দশজন শিশুর মধ্যে সাতজনই অপুষ্টির শিকার। এদের অর্ধেকের বৃদ্ধি অস্বাভাবিক। দুঃখজনক হলেও সত্য যে এর ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দৈহিক ও মানসিক গঠন ব্যাহত হচ্ছে, যা কোনোক্রমেই একটি উন্নত জাতি গঠনের সহায়ক

নয়। এর ফলে জনগোষ্ঠীর এক বিশাল অংশ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সঠিক ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। অর্থাৎ দারিদ্র্যের কারণে অপুষ্টি, আবার অপুষ্টির কারণে দারিদ্র্য সৃষ্টি হচ্ছে।

১৪. প্রযুক্তির নিম্ন ব্যবহার

বর্তমান বিশ্বকে শাসন করছে প্রযুক্তি। তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে ইতোমধ্যেই বিপ্লব ঘটে গেছে। কিন্তু আমরা প্রযুক্তিকে আমাদের দরিদ্র অবস্থা উন্নয়নে কাজে লাগাতে পারিনি। প্রযুক্তি ব্যবহারে আমরা অনেক পিছিয়ে রয়েছি। অথবা প্রযুক্তি ব্যবহারে আমাদের অনীহা। যেহেতু আমাদের জমির পরিমাণ নির্দিষ্ট এবং লোকসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে প্রতি বছর এর পরিমাণ ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে, তাই আধুনিক প্রযুক্তির সর্বাত্মক ব্যবহার আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।

১৫. নিরাপত্তার অভাব তথা আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি

নিরাপত্তার অভাবে তথা আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির কারণে অনেককে নিজস্ব ভিটে-মাটি ছেড়ে যেতে হচ্ছে। অথবা জোর করে ক্ষমতাশালীরা দখল করে নিচ্ছে। আবার অনেক সময় জীবনের নিরাপত্তার অভাবে এলাকা ছাড়তে হচ্ছে। তাছাড়া আইন-শৃঙ্খলা অবনতির কারণে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শিল্প-কারখানা গড়ে না ওঠায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়নি। ফলে জনসংখ্যার একটি অংশ বাড়ি-ঘর বিক্রি করে অন্যত্র অভিবাসন করছে কাজের আশায়। এভাবে একটা অংশ জমি হারিয়ে দরিদ্র হয়ে পড়ছে।

১৬. নারী উন্নয়ন

দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক হচ্ছে নারী। নারীদের জন্য সরকারের সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত না হওয়ায় তারা অনেকটা কর্মহীন হয়ে আছে। তাই নারী উৎপাদনকর্মে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ না পাওয়ায় পরিবারের প্রয়োজনীয় আয় বাড়ছে না। ফলে পরিবারের ভরণপোষণ তথা জীবিকা নির্বাহ কঠিন হয়ে পড়েছে। এভাবে এক সময় তারা দারিদ্র্যের করাল গ্রাসে হারিয়ে যাচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) শূন্যস্থান পূরণ করুন

১। বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার---------- ভাগ।

২। মানবসমাজে দারিদ্র্যের মূল করণ---------- বৈষম্য।

৩। প্রতিবছরেই কৃষিজাত---------- হচ্ছে।

৪। ---------- স্বল্পতা বাংলাদেশে দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ।

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

(ক) বাংলাদেশে দারিদ্র্যের কারণসমূহ আলোচনা কারুন।

(ক) উত্তরমালা

১। ৪০, ২। সামাজিক, ৩। খণ্ডিত, ৪। সম্পদ।

পাঠ-২ : দারিদ্র্য নিরসনের উপায়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- বাংলাদেশে দারিদ্র্য নিরসনের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- কিভাবে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

দারিদ্র্য একটি বহুমাত্রিক ও জটিল সমস্যা। এর আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক রয়েছে। তাই দারিদ্র্য-বিমোচনে সামগ্রিকভাবে কাজ করতে হবে। দারিদ্র্য বিমোচনের কোন তাৎক্ষণিক সমাধান নেই। মানব সমাজেই এর উদ্ভব। তাই সমগ্র মানব সমাজকে দারিদ্র্য বিমোচনে আন্তরিক হতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারি বেসরকারি উভয় প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব রয়েছে। নিম্নে দারিদ্র্য বিমোচনের উপায় সমূহ ব্যাখ্যা করা হলো।

১। শিক্ষার প্রসার : দারিদ্র্য বিমোচনের সঙ্গে শিক্ষার প্রসারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। অন্যকথায়, দারিদ্র্যের সঙ্গে নিরক্ষরতার সম্পর্ক রয়েছে। দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর প্রায় সবাই নিরক্ষর কিংবা স্বল্প শিক্ষিত। একজন শিক্ষিত ব্যক্তি অশিক্ষিত ব্যক্তি অপেক্ষা অনেক সচেতন। শিক্ষিত ব্যক্তি স্বাবলম্বী হতে পারেন অল্প সময়ে। কাজেই দারিদ্র্য বিমোচনে শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

২। **কৃষি উন্নয়ন :** বাংলাদেশের এখনও প্রায় ৭০ ভাগ মানুষ কৃষির ওপর নির্ভরশীল। জাতীয় আয়ের প্রায় ২৯ ভাগ আসে কৃষি থেকে। কৃষিনির্ভর জনগোষ্ঠী মূলত গ্রামে বাস করে। আবার গ্রামেই দারিদ্র্যের হার শহরের তুলনায় বেশি। বিপুল জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর করে কৃষি উৎপাদনের ওপর। কাজেই কৃষির উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ সমাজ তথা বাংলাদেশের দারিদ্র্যের চিত্র পাল্টে দেয়া সম্ভব।

৩। **অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি :** ১৯৮০ থেকে' ১৯৯০ পর্যন্ত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গড় ছিল ১.৫ শতাংশ যা ১৯৯০-২০০০ দশকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩ শতাংশের বেশি হয়েছে। যদিও বিশ্বের নিম্ন আয়ের দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে ভালো। কিন্তু তা দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য যথেষ্ট নয়। বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় বাংলাদেশ ২০২০ শীর্ষক রিপোর্ট অনুযায়ী, আগামী দু'দশকে বাংলাদেশের বিদ্যমান দারিদ্র্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস করতে হলে কমপক্ষে ৭-৮% বার্ষিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হবে। রিপোর্টের বক্তব্য অনুযায়ী আমলাতান্ত্রিক অদক্ষতা ও দুর্নীতি হ্রাস, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ও অন্যান্য অন্তরায়সমূহ দূরীকরণ করা সম্ভব হলে উল্লিখিত প্রবৃদ্ধির হার অর্জন করে দেশের দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব।

৪। **মানবসম্পদ উন্নয়ন :** মানবসম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করলেও দেশের বিদ্যমান দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য তা যথেষ্ট নয়। পোলিও এবং কুষ্ঠ (Leprosey) রোগের দূরীকরণ ও প্রত্যাশিত গড় আয়ু বৃদ্ধি পেলেও বাংলাদেশে শিশু মৃত্যুসহ মাতৃমৃত্যুর হার এখানো অনেক বেশি। মাতৃমৃত্যুর হার এখনো শ্রীলংকার চেয়ে প্রায় ৬ গুণ বেশি। তদুপরি রয়েছে এইডস ও আর্সেনিকের মতো মারাত্মক স্বাস্থ্য সমস্যা। তাছাড়া বাংলাদেশে দক্ষ জনসংখ্যার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। শিক্ষার হার বাড়লেও শিক্ষার গুণগত মান আশাতীতভাবে কমেছে। এর সবগুলোই মানবসম্পদ উন্নয়নের পথে বিরাট অন্তরায়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টিকে প্রাধান্য দিয়ে মানব সম্পদ উন্নয়নে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারলে দারিদ্র্য আপনা থেকেই হ্রাস পাবে।

৫। **অবকাঠামো উন্নয়ন :** অবকাঠামো বিশেষ করে গ্রামীণ অবকাঠামোর উন্নয়ন দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য অত্যাবশ্যক। গ্রামীণ অবকাঠামোর মধ্যে রয়েছে– হাট-বাজার, রাস্তা-ঘাট, কালভার্ট, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, পাবলিক টয়লেট, নলকূপ, ছাউনি ঘর ইত্যাদি। বিদ্যুতায়ন, কৃষির জন্য সেচ ও নিকাশ নালা, ছোটখাট বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধও এর মধ্যে পড়ে। এসব অবকাঠামোর উন্নয়ন করে গ্রামীণ এলাকায় কৃষির উন্নয়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম বৃদ্ধি ঘটানো সক্ষম, যা পল্লী জনগণের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

৬। **ভূমির সংস্কার :** বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মানুষ ও ভূমির মধ্যকার সম্পর্ক অন্যন্ত নিবিড়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে সীমিত জাতীয় ভূ-সম্পদের উপর চাপ ক্রমাগত বাড়ছে। প্রাকৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে ভূমিহীন লোকের সংখ্যার বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৮৩-৮৪ সালের কৃষি শুমারি অনুযায়ী গ্রামীণ

পরিবারের মধ্যে ১.২ মিলিয়ন পরিবারের বাড়ি ও জমি কিছুই নেই। আরো ২.৮ মিলিয়ন পরিবারের কেবল বাড়ি আছে, কোন জমি নেই এবং ৩.৮ মিলিয়ন পরিবারের একটি বাড়ি আছে কিন্তু জমির পরিমাণ অর্ধ একরের কম। বিআইডিএস কর্তৃক পরিচালিত এক জরিপের তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা প্রতি বছর ২ শতাংশ হারে বাড়ছে। এসব লোক দারিদ্র্যের সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে। এদের কোন বাড়ি নেই, আশ্রয় নেই, নেই আয়ের কোন সুনির্দিষ্ট উৎস বা বাঁচার জন্য খাদ্যের নিশ্চয়তা। এরা সাধারণত বিত্তশালী লোকের দয়ার উপর নির্ভর করে বেঁচে আছে। গ্রামের এই বিশাল সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত ও অবহেলিত জনগণকে রক্ষা করতে হলে ভূমির সংস্কার দরকার। ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে ভূমি মালিকানার সর্বোচ্চ সীমানা পুনঃনির্ধারণ করে অতিরিক্ত জমি উদ্ধার করে এসব ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে। তাছাড়া সরকারের খাস জমিসহ নদী সিকস্তি থেকে প্রাপ্ত জমি, চর ইত্যাদি ভূমিহীনদের জন্য নির্ধারণ করে দিতে হবে। এভাবে ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম হলে তা দারিদ্র্য দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

৭। **ভূমিহীনদের পূনর্বাসন :** পল্লী বাংলায় যে বিশাল ভূমিহীন জনগোষ্ঠী রয়েছে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য সরকারিভাবে খাস জমি বিতরণ করা যেতে পারে। এসব জমি বাড়ি নির্মাণ ও খামারের জন্য ব্যবহার করা যাবে। সম্ভব হলে চাষাবাদের জন্য খাস জমি বিতরণসহ অন্যান্য সামাজিক সুযোগ-সুবিধা (যেমন– টিউবওয়েল স্থাপন, কমিউনিটি সেন্টার স্থাপন) এবং ঋণের ব্যবস্থাকরণ, প্রশিক্ষণ প্রদান প্রভৃতির মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিকারী কার্যক্রম বৃদ্ধি করা যেতে পারে। ভূমিহীনরা পুনর্বাসিত হলে তাদের আয়ের ব্যবস্থা হবে এবং ধীরে ধীরে আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্যের কবল থেকে তারা রেহাই পাবে।

৮। **গ্রামীণ উন্নয়ন :** কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশে ৭০ শতাংশের বেশি লোক কৃষির সাথে জড়িত। কৃষি বা কৃষকের ভাগ্যের উন্নয়ন না ঘটলে সার্বিক উন্নতি সম্ভব নয়। গ্রামীণ দরিদ্ররা শহরে আসে। তাই গ্রামীণ দারিদ্র্য রোধ করা গেলে স্বাভাবিকভাবে শহরের দারিদ্র্য নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

৯। **রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা :** দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক উন্নয়ন। আর রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। রাষ্ট্রীয় মূলধারার রাজনীতি থেকে হরতাল, সংঘাত ও রক্তপাত রাজনীতি পরিহার করতে হবে।

১০। **আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা :** দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে গণমুখী ও দৃঢ় করার জন্য দেশ থেকে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, ঘুষ, সস্তা রাজনীতি দূর করতে হবে এবং প্রশাসন ও অন্যান্য খাত থেকে অবৈধ লেনদেন বন্ধ করতে হবে। অন্যথায় ব্যক্তি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে না, যা দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য অত্যন্ত জরুরি।

১১। **বেসরকারি খাতের সম্প্রসারণ :** গ্রামীণ অর্থনীতিসহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেসরকারি খাতের ভূমিকা সম্প্রসারণ করতে হবে। সরকারি সংস্থাগুলো প্রতিবছর হাজার হাজার কোটি টাকা লোকসান দিচ্ছে যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে অন্যতম প্রধান অন্তরায়। তাই যত তাড়াতাড়ি বেসরকারিকরণ করা যায় ততই ভালো। কল-কারখানা, বিশেষ করে কুটির শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও উৎপাদন বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা নিতে হবে। গ্রামীণ অঞ্চলে কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এসব পদক্ষেপ গ্রামের দরিদ্র জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিসহ উন্নত জীবনযাপনে আগ্রহী করে তুলবে, যা দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য অপরিহার্য।

১২। **চরম দরিদ্রদের জন্য বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ :** দরিদ্রের মধ্যে বসবাসকারী দুঃস্থ মানুষের জন্য বিশেষ ধরনের প্রকল্প বা কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে যাতে তারা সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্যে দুষ্টচক্র থেকে বের হয়ে আসতে পারে। তাদের জন্য লাভজনক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাসহ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া গ্রামের চরম দরিদ্রদের নিকট পৌঁছানোর জন্য বিশেষ নজর দিতে হবে। কেননা তারা হচ্ছে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে দুর্বল অংশ এবং এদের নিকট পৌঁছানো খুবই কঠিন।

১৩। **নারী উন্নয়ন ও নারীর দারিদ্র্য বিমোচন :** দেশের প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী। তাছাড়া প্রায় শতকরা ২২ ভাগ পরিবার নারীপ্রধান এবং তাদের বেশির ভাগই আবার হতদরিদ্র। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে নারী-পুরুষ হিসেবে বিভাজন করলে দরিদ্র নারীর পাল্লাই ভারী হবে। তাই নারীর দারিদ্র্য দূরীকরণে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের সাথে দারিদ্র্য বিমোচন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেজন্য নারী উন্নয়নে

প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। এ লক্ষে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা একযোগে কাজ করতে হবে।

১৪। প্রশাসনিক সংস্কার : দেশের বিদ্যমান প্রশাসন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে এবং একে আরো বেশি গরিববান্ধব হতে হবে। জনগণের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী স্থানীয় ও জাতীয় উন্নয়নের অগ্রাধিকার পুনর্নির্ধারণ করতে হবে। অংশগ্রহণমূলক শাসন ব্যবস্থাই কেবল এ ধরনের অগ্রাধিকার পুনর্নির্ধারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

১৫। বিবিধ : দারিদ্র্য বিমোচনে অন্যান্য আরো যেসব ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে সেগুলো হলো–

(ক) ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির প্রসার ঘটানো।
(খ) তথ্যপ্রযুক্তি প্রসার।
(গ) কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠন।
(ঘ) গ্রাম বাংলায় 'ক্ষুদ্র শহর' তৈরি।
(ঙ) অর্থ ছাড়াও সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা সম্পদের উপর গরিবদের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
(চ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় বেসরকারিভাবে সামাজিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

সারসংক্ষেপ

দারিদ্র্য বিমোচনের কোন তাৎক্ষণিক সমাধান নেই। দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষে সুপরিকল্পিত কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। দারিদ্র্য বিমোচনে রাষ্ট্র তথা সরকারকেই মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে।

দারিদ্র্য বিমোচনে কৃষি উন্নয়ন, শিক্ষার প্রসার, মানবসম্পদ উন্নয়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন, ভূমি সংস্কারসহ গ্রামীণ উন্নয়নকে গুরুত্ব দিতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) সত্য-মিথ্যা নির্ণয় : সত্য হলে 'স' মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

১। দারিদ্র্য বিমোচনে কোন ম্যাজিক সমাধান নেই।
২। দেশে দক্ষ জনসংখ্যার তেমন কোন অভাব নেই।
৩। দারিদ্র্য বিমোচনে শিক্ষার ভূমিকা নেই।
৪। দেশে ভূমিহীন লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। দারিদ্র্য বিমোচনের উপায় সমূহ আলোচনা করুন।
২। কিভাবে দারিদ্র্য বিমোচন করা সম্ভব তা বর্ণনা করুন।

(ক) উত্তর মালা

১। স, ২। মি, ৩। মি, ৪। স।

পাঠ-৩ : বাংলাদেশের কৃষি সমস্যা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- বাংলাদেশের কৃষি সমস্যার প্রকৃতি সম্পর্ক আলোচনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের কৃষিতে বিদ্যমান সমস্যা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশের কৃষি

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের কৃষি ব্যবস্থা খুবই অনুন্নত। অনুন্নত চাষ পদ্ধতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সার, বীজ, মূলধনের অভাব, জনসংখ্যার অতিরিক্ত চাপ, ভূমির উর্বরতা হ্রাস ইত্যাদি বহুবিধ ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে এদেশের একর প্রতি ফলন খুব বেশি নয়। উন্নত দেশে যেখানে গড়ে একর প্রতি ৫০ হতে ৬০ মণ ধান উৎপন্ন হয়, সেখানে বাংলাদেশে একর প্রতি গড়ে মাত্র ১৩ থেকে ১৪ মণ ধান উৎপন্ন হয়। তাই বাংলাদেশে প্রত্যেক বছর বিপুল পরিমাণ খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়।

বাংলাদেশে কৃষি সমস্যা

নিম্নে বাংলাদেশে কৃষির সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

১. **প্রকৃতি নির্ভরতা :** বাংলাদেশে কৃষির অন্যতম সমস্যা হলো এর প্রকৃতি নির্ভরতা। কারণ আমাদের দেশের সেচ ব্যবস্থা অত্যন্ত অনুন্নত বলে মৌসুমী বৃষ্টিপাতের উপর কৃষি অত্যন্ত নির্ভরশীল। সময়মত ও পরিমিত বৃষ্টিপাত হলে ফসল ভাল হয়। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই মৌসুমী বায়ুর খামখেয়ালির জন্য বৃষ্টিপাত অনিয়মিত হয়। এজন্য বলা হয়– 'Agriculture system of Bangladesh is a gamble of the Monson'. যা কৃষিকার্যের পক্ষে বিশেষ অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

২. **প্রাচীন পদ্ধতির চাষাবাদ :** বাংলাদেশে কৃষির অনগ্রসরতার অন্যতম কারণ প্রাচীন পদ্ধতির চাষাবাদ। বিভিন্ন প্রকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে এখনো আমাদের দেশে আধুনিক পদ্ধতির চাষাবাদ ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হয়নি। ফলে কৃষিযোগ্য প্রচুর উর্বর জমি থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে একর প্রতি ফলন অত্যন্ত কম এবং ফসলের মান ও গুণ নিম্নমানের।

৩. **কৃষি ভূমির খণ্ড-বিখণ্ডতা ও বিচ্ছিন্নতা :** বিভিন্ন প্রকার পারিবারিক, ধর্মীয় ও সামাজিক কারণে বাংলাদেশের কৃষকদের ভূমিগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত এবং বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত। কৃষি ভূমির খণ্ড-বিখণ্ডতা ও বিচ্ছিন্নতার কারণে একদিকে যেমন আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা সম্ভব হয় না তেমনি কৃষকদের সময় এবং অর্থেরও যথেষ্ট অপচয় ঘটে।

৪. **পানি সেচের অভাব :** বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থার অনুন্নতির অন্যতম কারণ হলো পানি সেচের অভাব। বিশেষ করে খরা বা শুষ্ক মৌসুমে বৃষ্টির পানির উপর নির্ভর করে জমি চাষাবাদ করা সব সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। ফলে পানি সেচের অভাবে অনেক জমির ফসল নষ্ট হয়ে যায় এবং বেশ কিছু পরিমাণ জমিতে ফসল ফলানো সম্ভব হয় না।

৫. **প্রয়োজনীয় মৌসুমী মূলধনের অভাব :** বাংলাদেশে কৃষি অনুন্নতির অন্যতম বাধা হলো মৌসুমী মূলধনের অভাব। চাষের মৌসুমে প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাবে কৃষকেরা লাঙ্গল, গরু, বীজ, সার, কীটনাশক ওষুধ ইত্যাদি সময়মত যোগান দিতে পারে না। ফলে কৃষিকার্য বাধাপ্রাপ্ত হয়।

৬. **অশিক্ষিত ও দরিদ্র কৃষক :** বাংলাদেশের কৃষকগণ একদিকে দরিদ্র এবং অপর দিকে অশিক্ষিত। তাছাড়া তারা সহজেই নানা রকম গোঁড়ামি, কুসংস্কার আর অদৃষ্টবাদিতায় বিশ্বাস করে। তাই আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্বন্ধে এরা অজ্ঞ থাকে। ফলে সরকারি প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও কৃষির আধুনিকীকরণ সম্ভব হয়ে উঠছে না।

৭. **জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা :** বাংলাদেশের কৃষির উন্নতির মূলে জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততা অন্যতম বাধা হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় প্রায় ২ হাজার ৪৬৪টি হাওর ও বিলে ৭ লক্ষ ২৪ হাজার একর জমি জলাবদ্ধতার কারণে অনাবাদী অবস্থায় রয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় বিস্তৃর্ণ এলাকার কৃষিযোগ্য ভূমির ফসল প্রায় প্রতি বছরই সমুদ্রের লোনা পানি ঢুকে নষ্ট করে ফেলে।

৮. **ভূমির ক্ষয় :** ভূমির ক্ষয়ের কারণে বাংলাদেশের মৃত্তিকার উপরিভাগের পলিমাটি অপসারিত হয়। ফলে ভূমি অনুর্বর ও লবণাক্ত হয়ে পড়ে। এটি একর প্রতি ফসল কম হবার অন্যতম কারণ।

৯. **কীটপতঙ্গের আক্রমণ ও ফসলের বিভিন্ন রোগ :** প্রতি বছর বাংলাদেশে ফসল ধ্বংসকারী কীটপতঙ্গ ও প্রাণীর আক্রমণে প্রচুর ফসল বিনষ্ট হয়। যেমন– লেদা পোকা, মাজরা পোকা, ইঁদুর ইত্যাদি। তাছাড়া বিভিন্ন রোগের আক্রমণে একর প্রতি ফসল কম হয়।

১০. **ভাল সার ও উন্নত বীজের অভাব :** বাংলাদেশে কৃষির উন্নতির অন্যতম বাধা হলো ভাল সার ও উন্নত বীজের অভাব। বাংলাদেশের কৃষকেরা অশিক্ষিত এবং দরিদ্র। ফলে তারা উৎকৃষ্ট সার ও বীজ যোগাড় করতে পারে না এবং এগুলোর সঠিক ব্যবহার সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান সীমিত।

১১. **কীটনাশক ওষুধের অভাব :** ক্ষেতের ফসল বিনষ্টকারী কীটপতঙ্গকে ধ্বংস করার মত প্রয়োজনীয় কীটনাশক ওষুধ আমাদের কৃষকের চাহিদা অনুযায়ী পাওয়া যায় না। অবশ্য বাজারে কিছু কিছু কীটনাশক ওষুধ পাওয়া গেলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা ভেজাল মিশ্রিত এবং নিম্নমানের।

১২. **মৌসুমী বেকারত্ব :** বাংলাদেশের কৃষির অনুন্নতির এটিও একটি অন্যতম কারণ। কেননা বর্ষা মৌসুমে ফসল উঠিয়ে নেবার পর পরবর্তী ফসল আসা পর্যন্ত কৃষকগণ তিন মাস বেকার থাকে। ফলে পূর্বের অর্জিত আয় নিঃশেষ হয়ে যায় এবং গরিব কৃষক গরিবই থেকে যায়।

১৩. **ত্রুটিপূর্ণ বাজার ব্যবস্থা :** ত্রুটিপূর্ণ বাজার ব্যবস্থাও বাংলাদেশের কৃষি অনগ্রসরতার আর একটি অন্যতম কারণ। অনুন্নত পরিবহন ব্যবস্থা, পণ্য সংরক্ষণের অভাব, অধিক মধ্যস্বত্ব কারবারি উপস্থিতি, সংগঠিত বাজারের অভাব বিদ্যমান। ফলে কৃষকগণ ফসলের ন্যায্য মূল্য পায় না।

১৪. **কৃষি ঋণের অভাব :** আমাদের দেশের কৃষকেরা অত্যন্ত গরিব। প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ ক্রয় ও কৃষি কাজ পরিচালনার জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা অধিকাংশ কৃষকের নেই। ফলে তাদেরকে ঋণ করতে হয়। কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণ কৃষি ঋণের অভাবে কৃষকেরা তাদের চাহিদা অনুযায়ী ঋণ পায় না। কৃষি ঋণের অভাবে কৃষকেরা ভালভাবে জমি চাষাবাদ করতে পারে না।

১৫. **প্রাকৃতিক দুর্যোগ :** বাংলাদেশের কৃষির আরো একটি সমস্যা হলো বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ। যেমন– অতি বৃষ্টের জন্য বন্যা ও জলাবদ্ধতা, অনাবৃষ্টির জন্য খরা, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, কালবৈশাখী ইত্যাদি। ফলে প্রায় প্রতি বছরই প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বিভিন্ন সময়ে কোটি কোটি টাকার ফসল নষ্ট হয় এবং কৃষকগণ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১৬. **ভূমির মালিকানা :** বাংলাদেশে কৃষি ব্যবস্থার উন্নতির অন্যতম অন্তরায় হলো ভূমির মালিকানা। কারণ প্রকৃত কৃষকদের অধিকাংশই ভূমিহীন এবং অন্যের জমি বর্গা প্রথায় চাষ করে।

১৭. **ত্রুটিপূর্ণ ভূমি ব্যবস্থা :** বাংলাদেশের কৃষিতে ত্রুটিপূর্ণ ভূমি ব্যবস্থা বিদ্যমান। অনেক কৃষকই ভূমিহীন। অনেক বর্গাচাষির জমি নেই। অন্যদিকে ধনীরা অনেক জমির মালিক।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের কৃষিতে অসংখ্য সমস্যা বিদ্যমান। প্রাচীন পদ্ধতির চাষাবাদ, প্রকৃতি নির্ভরতা, প্রযুক্তির স্বল্প ব্যবহার, সেচের অভাব, উন্নত সার–বীজের অভাব ও এসব সমস্যা হলো অন্যতম। কৃষি সমস্যা দূর করা সম্ভব না হলে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করা অসম্ভব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) শূন্যস্থান পূরণ করুন

১। বাংলাদেশের কৃষিতে ত্রুটিপূর্ণ ভূমি ব্যবস্থা —।

২। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে — হয়।

৩। কৃষির অন্যতম সমস্যা প্রকৃতি —।

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের কৃষি সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। বিদ্যমান, ২। দারিদ্র্যের সৃষ্টি, ৩। নির্ভরতা।

পাঠ-৪ : কৃষির বহুমুখীকরণ ও সরকারি নীতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- বাংলাদেশে কৃষির বহুমুখীকরণের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে কৃষি বহুমুখীকরণের সরকারি নীতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

কৃষি বহুমুখীকরণ

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষির ওপর এদেশের অর্থনীতি নির্ভরশীল। কিন্তু এদেশের কৃষিতে বহুমুখিতার ছোঁয়া লাগেনি। কৃষির বহুমুখীকরণের মাধ্যমে কৃষির দুরবস্থা কাটিয়ে ওঠা যায়। কৃষির বহুমুখীকরণ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে প্রাচীন চাষ পদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিক ও উন্নত পদ্ধতি এবং উপকরণের প্রয়োগ ঘটে। বহুমুখীকরণের ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ কৃষিক্ষেত্রে প্রাচীন চাষ পদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিক তথা বৈজ্ঞানিক চাষাবাদ প্রবর্তন করাই হলো কৃষির বহুমুখীকরণ। জাতিসংঘের মতে, 'কৃষির বহুমুখীকরণ হল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উপকরণের ব্যবহার।'

কৃষি বহুমুখীকরণের গুরুত্ব অপরিসীম। কৃষিপ্রধান দেশ হয়েও খাদ্য ঘাটতির কারণে বিদেশ থেকে বাংলাদেশকে খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়। সুতরাং উপযুক্ত ব্যবহার করে অবিলম্বে এদেশের কৃষির ফলন বৃদ্ধি করা দরকার। কৃষি বহুমুখীকরণে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন–

(১) **অনাবাদী জমি চাষ :** বাংলাদেশের পাহাড়ি অঞ্চল ও হাওড় এলাকায় বহু জমি পতিত রয়েছে। তাছাড়া ভিটেমাটি, পুকুরের পাড়, বাড়ির আশেপাশে অনাবাদী জমিতে তরকারি, শাকসব্জি, বৃক্ষরোপণ ও ফল–মূলের চাষ করা প্রয়োজন। কেননা কোনো প্রকার জমি পতিত রাখা যাবে না। গ্রামাঞ্চলে খাস পুকুর ও হাজামজা পুকুরগুলোকে সংস্কার করে মাছের চাষ করা প্রয়োজন।

(২) **শুষ্ক মৌসুমে পানি সেচ :** উপযুক্ত জল সেচের অভাবে আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণ জমি অনাবাদী থাকছে। প্রকৃতির খেয়ালখুশির ওপর নির্ভর না করে গভীর নলকূপ স্থাপন, খাল-খনন, নদী সংস্কার ইত্যাদির মাধ্যমে শুষ্ক মৌসুমে পর্যাপ্ত পানি সেচের ব্যবস্থা করে জমিতে বিভিন্ন ধরনের ফসলের চাষ করতে হবে।

(৩) **বিকল্প ফসল উৎপাদন :** আমাদের দেশে প্রতি বছর একই জমিতে একই প্রকার ফসল উৎপাদনের জন্য জমির উর্বরতা হ্রাস পায়। উচ্চফলনশীল বীজ ও সার ব্যবহার করে একই জমিতে বছরে তিন-চার ধরনের ফসল ফলানো যায়।

(৪) **জলাবদ্ধ ও নিচু জমি চাষ :** জলাবদ্ধতা দূরীকরণের মাধ্যমে কৃষির বহুমুখীকরণ সম্ভব। শক্তিশালী পাম্পের সাহায্যে পানি নিষ্কাশন করে নিচু জলাবদ্ধ জমিকে চাষের আওতায় আনতে হবে।

(৫) **সমবায় খামার গঠন :** বাংলাদেশে উত্তরাধিকার আইনের ফলে কৃষিজমি বহুখণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। জমির খণ্ডিতকরণ রোধ ও অধিক ফসল ফলানোর জন্য সমবায় চাষ পদ্ধতি প্রবর্তন করা প্রয়োজন। এতে পরিকল্পিত উপায়ে বিভিন্ন জাতের ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

কৃষি বহুমুখীকরণের সরকারি নীতি

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির সঞ্জীবনী শক্তির আধার। আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কৃষি উন্নয়নের ওপর নির্ভরশীল। কৃষির গুরুত্ব উপলব্ধি করে সরকার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। পরবর্তী পৃষ্ঠায় কৃষি বহুমুখীকরণে সরকারের কার্যক্রম উল্লেখ করা হলো :

(১) **ভূমি সংস্কার :** ভূমি সংস্কার বাংলাদেশ সরকারের কৃষি উন্নয়নের বাস্তব পদক্ষেপ। কৃষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ও ভূমির উন্নয়নের জন্য সরকার ২৫ বিঘা জমির খাজনা মওকুফ করেছে। খাস জমিগুলো ভূমিহীন কৃষকদের মাঝে বিতরণের ব্যবস্থা করেছে। এ সব কারণে কৃষকদের মাঝে উৎসাহ ও উদ্দীপনা বেড়েছে।

(২) **কৃষি ব্যাংক স্থাপন :** সরকার মাঝারি ও ক্ষুদ্র কৃষকদের মাঝে ঋণ বিতরণের উদ্দেশ্যে ঋণদান কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এই কর্মসূচির আওতায় কৃষকেরা অনায়াসে সার, বীজ, কীটনাশক, সেচ সুবিধাদি গ্রহণ করে। তাছাড়া সরকার অক্ষম কৃষকদের পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ মওকুফ করেছে।

(৩) **কৃষিপণ্য সংরক্ষণ :** সরকার কৃষিজাত পণ্য সংরক্ষণের জন্য গুদাম, সাইলো ও হিমাগার নির্মাণ করেছে।

(৪) **কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন :** সরকার কৃষি উন্নয়নের জন্য মাধ্যমিক পর্যায়ে কৃষি শিক্ষাকে পৃথক বিষয় হিসেবে চালু করেছেন। তাছাড়া কৃষি উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণের জন্য কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন করেছে।

(৫) **কৃষি উন্নয়নের ব্যয় বরাদ্দ :** সরকার কৃষির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য কৃষি বহুমুখীকরণের লক্ষে কৃষিখাতের বাজেটে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ রাখে। তাছাড়া সরকার কৃষি ব্যস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য কৃষিনীতি চালু করেছে।

(৬) **ভর্তুকী কর্মসূচি :** সরকার কৃষি উন্নয়নে ভর্তুকী চালু করেছে। ভর্তুকীর মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে ফসল বৃদ্ধি সম্ভব।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষিই এদেশের প্রাণ। কৃষিকে উপেক্ষা করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অসম্ভব। জাতীয় অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হলো কৃষি। তাই কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতে", কৃষি উন্নয়ন ব্যতীত শিল্প উন্নয়ন সম্ভব নয়। সরকার ও নাগরিকবৃন্দ একযোগে আন্তরিকতার সাথে কাজ করলে কৃষি উন্নয়নে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটবে। কৃষি বহুমুখীকরণের ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমি সংস্কার করা হলে কৃষি উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) রচনামূলক প্রশ্ন

১। কৃষি বহুমুখীকরণ বলতে কী বোঝেন? কৃষির বহুমুখীকরণে সরকারি নীতির ইতিবাচক প্রভাব কীভাবে পাওয়া যেতে পারে?

(খ) সত্য-মিথ্যা : সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন

১। সরকার কৃষি উন্নয়নে ভর্তুকী ব্যবস্থা চালু করেছে।

২। ২৫ বিঘা জমি থাকলে খাজনা দিতে হয়।

৩। বাংলাদেশকে খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়।

(খ) উত্তরমালা

১। স, ২। মি, ৩। স।

পাঠ-৫ : খাদ্যাভাব ও পুষ্টিহীনতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- খাদ্যাভাব ও পুষ্টিহীনতা বলতে কি বুঝায় তা বর্ণনা করতে পারবেন ।
- বাংলাদেশে খাদ্যাভাব ও পুষ্টিহীনতার কারণসমূহ আলোচনা করতে পারবেন ।

দক্ষ জনশক্তি যে কোন দেশের অমূল্য সম্পদ । তবে দক্ষ জনশক্তি আপনা আপনি গড়ে ওঠে না । এর জন্য সবার আগে দরকার জনস্বাস্থ্যের মান উন্নয়ন । দুঃখজনক হলেও সত্য বাংলাদেশে জনস্বাস্থ্যের মান অত্যন্ত নিম্ন । এর প্রধান কারণ খাদ্যভাব ও পুষ্টিহীনতা । সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে, দেশের প্রায় অর্ধেক মানুষ খাদ্যাভাব ও পুষ্টিহীনতার শিকার । তারা তাদের প্রয়োজনীয় ক্যালরি নিয়মিত গ্রহণ করতে পারে না । দারিদ্র্য এর প্রধান কারণ হলেও একমাত্র কারণ নয় । জনসচেতনতা ও স্বাস্থ্যজ্ঞানের অভাবও খাদ্যাভাব ও পুষ্টিহীনতার কারণ ।

বাংলাদেশের মানুষের আয় কম । এজন্য সঞ্চয় কম । সঞ্চয় কম বলে বিনিয়োগ কম । আবার বিনিয়োগ কম বলে আয় কম । দারিদ্র্যের এই দুষ্টচক্রে শত শত বছর বন্দি বাংলাদেশ । ভয়াবহ দারিদ্র্যের কারণে দেশের ৪০ ভাগ মানুষ তিনবেলা ঠিকমতো খেতে পারে না । অথচ 'খাদ্য' পাঁচটি মৌলিক অধিকারের প্রধানতম অধিকার । দারিদ্র্যের সাথে যুক্ত হয়েছে উচ্চ বেকারত্ব হার ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি । তদুপরি রাষ্ট্রের উদাসীনতাও বিদ্যমান । আর এ কারণে খাদ্য সাহায্য অনেক ক্ষেত্রেই সঠিকভাবে বণ্টন হয় না । নদী ভাঙ্গন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, চাষাবাদের জমির স্বল্পতা প্রভৃতি কারণে প্রতিনিয়ত শহরে ছুটছে ছিন্নমূল মানুষ । এদের অধিকাংশই বস্তিতে, রেল স্টেশনে, ফুটপাতে বাস করে । বাস্তুচ্যুত এই লোকদের খাদ্য নিরাপত্তা অত্যন্ত ভঙ্গুর । কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করে বাংলাদেশ খাদ্য সমস্যা মোকাবেলার চেষ্টা করছে । তবে বাংলাদেশ এখনও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় । বাংলাদেশকে বছরে প্রায় ৩০ লাখ টন খাদ্যশস্য বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয় ।

পুষ্টিহীনতা জনস্বাস্থ্যের জন্য সবচে বড় হুমকি । মূলত খাদ্যাভাবের কারণেই দেশের জনগণের একটি বড় অংশ পুষ্টিহীন । পুষ্টিহীনতা সবচে বেশি দেখা যায় মা ও শিশুর ক্ষেত্রে । আবার অনেক ক্ষেত্রে খাদ্যাভাব না থাকলেও পুষ্টিহীনতা থাকতে পারে । পুষ্টিহীনতা দূর করার জন্য দরকার সুষম খাদ্যের অভ্যাস ।

খাদ্যপ্রাণ ও ভিটামিনের অভাবে পুষ্টিহীনতা ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে । এ প্রেক্ষাপটেই পুষ্টিহীনতা একটি জাতীয় সমস্যায় পরিণত হয়েছে । সচেতনতার অভাবও পুষ্টিহীনতার আরেকটি বড় কারণ । ময়লা, আবর্জনা, দূষিত পরিবেশে খাদ্য গ্রহণের কারণে পেটের পীড়া, অসুখ-বিসুখ লেগেই আছে । অনেক ক্ষেত্রেই বিশুদ্ধ পানির অভাবে মানুষ ডায়রিয়া, কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েডে আক্রান্ত হচ্ছে ।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে খাদ্যাভাব ও পুষ্টিহীনতা ব্যাপকভাবে বিরাজমান । দারিদ্র্য ছাড়াও এর কারণ শিক্ষা ও জনসচেতনতার অভাব । প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সরকারের উদাসীনতা খাদ্যাভাব ও পুষ্টিহীনতাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে । কৃষির বহুমুখীকরণ ও আধুনিকীকরণের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বাড়িয়ে খাদ্যাভাব ও পুষ্টিহীনতার সমস্যা কার্যকরভাবে মোকাবেলা করা যায় ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও।

১। বাংলাদেশের কত ভাগ মানুষ প্রয়োজনীয় খাদ্য পায় না?

(ক) ৪০ ভাগ (খ) ৫০ ভাগ

(গ) ৬০ ভাগ (ঘ) কোনটি নয়

২। কাদের খাদ্য নিরাপত্তা অত্যন্ত ভঙ্গুর?

(ক) শ্রমিকদের (খ) কৃষকদের

(গ) বাস্তুচ্যুতদের (ঘ) বস্তিবাসীদের

৩। জনস্বাস্থ্যের জন্য সবচে বড় হুমকি–

(ক) পুষ্টিহীনতা (খ) ডাক্তারদের অভাব

(গ) সরকারের উদাসীনতা (ঘ) রাজনৈতিক অস্থিরতা

৪। বাংলাদেশকে বছরে কত টন খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়?

(ক) এক লাখ টন (খ) ২০ লাখ টন

(গ) ২৫ লাখ টন (ঘ) ৩০ লাখ টন

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের খাদ্যাভাব ও পুষ্টিহীনতার বিবরণ দিন।

২। বাংলাদেশে খাদ্যাভাব ও পুষ্টিহীনতার কারণসমূহ লিখুন।

(ক) উত্তরমালা

১। (ক) ২। (গ) ৩। (ক) ৪। (ঘ)

পাঠ -৬ : খাদ্যাভাব ও পুষ্টিহীনতা দূর করার উপায়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

➡ বাংলাদেশের খাদ্যাভাব ও পুষ্টিহীনতা দূর করার উপায় বর্ণনা করতে পাবেন।

ভূমিকা

খাদ্যাভাব বর্তমানে জাতীয় সমস্যায় পরিণত হয়েছে। গত ৪০ বছরে দেশের খাদ্য উৎপাদন তিনগুণ বাড়লেও এখনও প্রায় ৩ কোটি মানুষ খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার সঙ্গে পুষ্টিহীনতার যোগসূত্র অত্যন্ত নিবিড়। তবে জনসচেতনতার অভাবও পুষ্টিহীনতার আরেকটি বড় কারণ।

নিম্নে খাদ্যভাব ও পুষ্টিহীনতা দূর করার উপায় বর্ণনা করা হলো–

১. **কৃষির আধুনিকীকরণ** : কৃষির আধুনিকীকরণের মাধ্যমে বেশি পরিমাণ খাদ্যশস্যের উৎপাদন করতে হবে। বাংলার মাটি অনেক উর্বর হলেও এ কথা সত্য যে ভারত, চীন বা থাইল্যাণ্ডের তুলনায় আমাদের একর প্রতি উৎপাদন অনেক কম। কৃষির আধুনিকীকরণের মাধ্যমে দেশে খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে হবে। পর্যাপ্ত খাদ্য থাকলে ব্যক্তির ক্রয়ক্ষমতা কম থাকলেও তার পক্ষে খাদ্য কেনা সম্ভব।

২. **বিকল্প খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি :** শুধু প্রধান খাদ্যশস্য চাল, গম নয়; মৌসুমী ফল-মূল, শাক-সব্জি, তরকারি ও মাছ-মাংসের বৃদ্ধির ব্যবস্থা নিতে হবে। বিকল্প খাদ্যের মজুদ গড়ে তুলে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

৩. **খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি** : পতিত ভূমি, জলাশয়, বাড়ির পাশের আঙ্গিনা, খাল-বিল, মহাসড়কের দু'পাশ কৃষিপণ্য ও মাছের জন্য ব্যবহার করে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়াতে হবে। এসব এলাকায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন নিশ্চিত করা গেলে তা কৃষক সমাজ তথা গ্রামীণ এলাকায় খাদ্যাভাব ও পুষ্টিহীনতা দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

৪. **সরকারি সহায়তা :** খাদ্যাভাব ও পুষ্টিহীনতা দূরীকরণে সরকারি সহায়তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী, উদ্বাস্তু, বিধবা মহিলা, ছিন্নমূল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা বরাবরই হুমকির মুখে থাকে। ভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে বাস্তুচ্যুত, প্রতিবন্ধী ও অতি দরিদ্রের দ্বারে যাতে সঠিক সময়ে খাদ্য পৌঁছায়ে সেদিকে সরকারের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। একই সঙ্গে এসব কর্মসূচির সঠিক তদারকি করতে হবে।

৫. **উন্নত রেশনিং ব্যবস্থা :** উন্নত রেশনিং ব্যবস্থাসহ 'কাজের বিনিময় খাদ্য' কর্মসূচির বিস্তার করতে হবে। উন্নত রেশনিং ব্যবস্থা কেবল সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে এর আওতায় আনতে হবে।

৬. **সচেতনতা বৃদ্ধি:** খাদ্যাভাব ও পুষ্টিহীনতা দূরীকরণে জনগণকে ব্যাপকভাবে সচেতন করে তুলতে হবে। সচেতনতার অভাবও পুষ্টিহীনতার একটি বড় কারণ। ময়লা, আবর্জনা, দূষিত পরিবেশে খাদ্য গ্রহণের কারণে পেটের পীড়া, অসুখ-বিসুখ লেগেই আছে। অনেক ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ পানির অভাবে মানুষ ডায়রিয়া, কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েডে আক্রান্ত হচ্ছে। এসব বিষয়ে জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে। গণমাধ্যম ও রাষ্ট্রকে এজন্য বিশেষ ভূমিকা পালন করতে হবে। শিক্ষার বিস্তারও জরুরি। মনে রাখতে হবে– শিক্ষার বিস্তার ছাড়া দক্ষ জনশক্তি গড়া সম্ভব নয়।

৭. **তৃণমূল স্বাস্থ্যসেবা** : গ্রামীণ জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধরনের অসুখ-বিসুখে আক্রান্ত। গ্রামে সুচিকিৎসার বড়ই অভাব। অবকাঠামো সমস্যা ছাড়াও চিকিৎসকদের শহরগামী মানসিকতা এজন্য অনেকাংশে দায়ী।

অভিযোগ রয়েছে, গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তাররা বসতে পছন্দ করে না। সরকারকে এদিকটায় বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে হবে। কেননা গ্রামীণ পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা না গেলে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সমস্যা দূর হবে না। এজন্য তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশে কয় কোটি মানুষ খাদ্য ঝুঁকিতে রয়েছে-

(ক) এক কোটি (খ) দুই কোটি

(গ) তিন কোটি (ঘ) চার কোটি

২। গত ৪০ বছরে দেশের খাদ্য উৎপাদন কতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে?

(ক) দ্বিগুণ (খ) তিন গুণ

(গ) চার গুণ (ঘ) পাঁচ গুণ

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের খাদ্যাভাব ও পুষ্টিহীনতা দূর করার উপায়সমূহ লিখুন।

(ক) উত্তরমালা

১। (গ) ২। (খ)